بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১ মে, ২০১৫ মোতাবেক ১ হিজরত, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী বর্ণনা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এসব ঘটনা থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে এমন সব ফলাফল গ্রহণ করেন, যা ঈমানের সঠিক পথ চিহ্নিত করে একজন মু'মিনকে প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লা এবং তাঁর সত্য ধর্ম নিরূপণ ও এর ব্যুৎপত্তি অর্জনে সহায়ক হয়। একবার তিনি (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় আয়াতুল কুরসীর তফসীর বর্ণনা করছিলেন। لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৬) আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খোদা তা'লা বলেন, তোমাদের খোদা এমন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই যখন তাঁর, তাহলে তোমরাই এখন বল, তাঁর বিপরীতে তোমরা অন্য কাউকে কীভাবে নিজের প্রভু বানাতে পার? মানুষ বলে, আমরা খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করি না, আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করি না, তবে আমরা তাদেরকে উপঢৌকন দেই আর তাদের কাছে যাচনা করি। কেননা, তারা খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং তারা আমাদের জন্য খোদা তা'লার কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ করবে। তিনি (রা.) বলেন, খোদা তা'লা বলেছেন, আমার অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারে না। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেয়ে বড় আর কে হতে পারে? কিন্তু একবার, নবাব সাহেবের অর্থাৎ, নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের পুত্র আব্দুর রহীম খানের অসুস্থতার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন তার জন্য দোয়া করেন, তখন ইলহাম হয়, **'সে আর বাঁচবে না'**। তিনি (আ.) ভাবেন, নবাব সাহেব নিজের সবকিছু পরিত্যাগ করে কাদিয়ান আসতে যাচ্ছেন। তার ছেলে মারা গেলে তিনি না আবার কোন পরীক্ষায় নিপতিত হয়ে যান। তাই তিনি (আ.) খোদা তা'লার কাছে নিবেদন করেন, **হে খোদা! আমি এই ছেলের আরোগ্যের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ করছি**। তখন ইলহাম হয়, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ অর্থাৎ, আমার অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করার তুমি কে? দেখুন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন! তেরশ' বছর যাবৎ বিশ্ববাসী তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন সুপারিশ করেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি কে, যে বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করছ? হযরত সাহেব [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] বলেন, আমার উপর যখন এই ইলহাম হয় তৎক্ষণাৎ আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি এবং আমার সারা শরীরে কম্পন শুরু হয়, এমনকি আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু এই অবস্থা হবার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঠিক আছে, তোমাকে শাফায়াত বা সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হল, শাফায়াত কর। অতঃপর তিনি শাফায়াত করেন আর আব্দুর রহীম খান সুস্থ হয়ে উঠেন।

শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়া গেছে আর সেই দোয়াও কবুল হয়েছে- এটি ছিল খোদা তা'লার অনুগ্রহ। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মত ব্যক্তিকেও আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন, সুপারিশ করার তুমি কে? সেক্ষেত্রে অন্যরা, যারা বড় সেজে বেড়ায় তাদের কীইবা যোগ্যতা আছে যে, তারা কারো জন্য সুপারিশ করবে? বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)ও কেবল তখনই শাফায়ত করবেন, যখন অনুমতি দেয়া হবে। অতএব, কতই না অজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে বলে, অন্য কেউ আমার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। **(বারাকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১)**

এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশের মানুষের মাঝে এবং আমাদের সমাজে কবর পূজার মত পাপের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আর মানুষ এই পাপে লিপ্ত হয়ে শির্‌ক করে এবং পীর-ফকিরের পূজা করে।

তাই, প্রত্যেক আহমদীর এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কেও একথাই বলেছেন, অনুমতি যখন দেয়া হবে তখনই সুপারিশ করা যাবে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, বাব: কালামু রাব্বি আয্‌যা ওয়া জাল্লা ইয়াওমাল কিয়ামাতি মাআল আম্বিয়া ওয়া গাইরিহীম, হাদীস নং ৭৫১০)**

এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে কীভাবে নিজ ক্ষমতার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করতেন, এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাশি হয়। তাঁর (আ.) সবচেয়ে ছোট ছেলে মুবারক আহমদের চিকিৎসার জন্য তিনি সারা রাত নির্ঘুম কাটাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, সে সময় আমি রাত প্রায় বারটার দিকে ঘুমাতাম আর তাড়াতাড়ি উঠেও যেতাম। কিন্তু আমি যখন ঘুমাতে যেতাম তখনও হযরত সাহেবকে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] জাগ্রত দেখতাম আবার যখন ঘুম থেকে উঠতাম তখনও তাঁকে জাগ্রত পেতাম। এই পরিশ্রমের ফলে তাঁর (আ.) কাশি আরম্ভ হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। **(তকদীরে ইলাহী, আনোয়ারুল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৭৯)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, আমার দায়িত্ব ছিল সময়মত তাঁকে (আ.) ঔষধ-পথ্যাদি খাওয়ানো আর স্বাভাবিকভাবেই যার উপর কোন কাজ ন্যস্ত হয়, সে এতে হস্তক্ষেপ করাও নিজের অধিকার মনে করতে আরম্ভ করে। কম্পাউন্ডারির অধিকার বলে আমিও মনে করতাম, তাঁর (আ.) খাবার দাবারে কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করি। অতএব, পরামর্শরূপে মাঝে মধ্যে বলেও বসতাম, এটা খাবেন না, সেটা খাবেন না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যবস্থাপত্র অনুসারেও ঔষধ তৈরি করে সেবন করানো হত আর প্রচলিত আধুনিক ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ীও ঔষধ সেবন করা হত। কিন্তু কাশি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এটি ১৯০৭ সনের ঘটনা। আর আব্দুল হাকীম মুরতাদ (আহমদীয়াত পরিত্যাগকারী) তাঁর (আ.) এই কাশির খবর (পত্রিকায়) পড়ে এ কথাও লিখেছিল যে, মির্যা সাহেব যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন। তাই, আমাদের এই ভাবনাও ছিল, সে যেন অলীকভাবে হলেও আনন্দ করার কোন প্রকার ছুঁতো খুঁজে না পায়। কিন্তু তাঁর (আ.) কাশির কষ্ট অনেক বেশিই ছিল। আর অনেক সময় এত দীর্ঘক্ষণ একটানা কাশি হত যে, মনে হত যেন নিঃশ্বাস বন্ধই হয়ে যাবে। এমন সময় বাহির থেকে কোন এক বন্ধু আগমন করেন (অর্থাৎ, শারীরিক অবস্থা যখন এমন ছিল, তখন কোন এক বন্ধু বাহির থেকে আসেন) আর উপহারস্বরূপ কিছু ফল নিয়ে আসেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি সেগুলো হুযূরের সামনে উপস্থাপন করি। তিনি সেগুলো দেখেন এবং বলেন, সেই বন্ধুকে 'জাযাকাল্লাহ্' বলে দাও। এরপর তিনি (আ.) সেখান থেকে কোন একটি ফল, যা সম্ভবত কলা ছিল, হাতে নেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যেহেতু ঔষধ ইত্যাদি সেবন করাতাম সেই কারণে অথবা হয়ত আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কাশির মধ্যে এটি খাওয়া কেমন হবে? আমি বললাম, ভালো হবে না। কিন্তু তিনি (আ.) মুচকি হাসেন এবং খোসা ছাড়িয়ে সেটি খেতে আরম্ভ করেন। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, আপনার কাশি অনেক বেশি আর এটি কাশির জন্য ভালো জিনিস নয়। তিনি (আ.) পুনরায় মুচকি হাসেন এবং খেতে থাকেন। আমি নিজের অজ্ঞতার কারণে পুনরায় এই কথায় জোর দেই যে, এটি খাওয়া উচিত নয়। এতে তিনি পুনরায় মুচকি হাসেন এবং বলেন, এখনই আমার উপর ইলহাম হয়েছে যে, কাশি সেরে গেছে। অতএব, কাশি তখনই কমতে থাকে।

অথচ ঠিক তখন কোন ঔষধও সেবন করেন নি আর কোন বিশেষ পথ্যও গ্রহণ করেন নি, বরং পথ্য পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাশি সেরে যায়। যদিও এর পূর্বে এক মাস যাবৎ চিকিৎসা করা হচ্ছিল কিন্তু কাশি সারছিল না। মোটকথা, এটি এক ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল। তিনি (রা.) বলেন, সাধারণত পথ্য পরিপন্থী কাজ করার ফলে বিভিন্ন অসুখও হয়ে যায় আর চিকিৎসার ফলে আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লা চান, **তখন তিনি হস্তক্ষেপও করে থাকেন। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে দোয়ার অস্ত্র (পরিচালনা) শিখিয়েছেন, যেন সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে** গিয়ে বলে, আমি স্বাধীনতা চাই না। আমি আমার পরিস্থিতির কারণে অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করুন। আর আল্লাহ্ তা'লাও যখন দেখেন, এই বান্দা আমার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল আর সে চায়, আমি যেন তার বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করি, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং নিজ ক্ষমতার নিদর্শন দেখান। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৫)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই উদাহরণ দেয়ার পর আরো একটি ঈমান উদ্দীপক উদাহরণ তুলে ধরেন, যা লেখরামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি (রা.) বলেন, লেখরামের ঘটনাও এই বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সুস্বাস্থ্যের সকল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও রোগ দেখা দেয়। (লেখরামের বিষয়ে) আল্লাহ্ তা'লা [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামের মাধ্যমে] অবগত করে রেখেছিলেন যে, ঈদের দ্বিতীয় দিন তার মৃত্যু হবে এবং তা আগামী ছয় বছরের মধ্যেই হবে। এখন ছয় বছর পর্যন্ত বছরে দু'তিন দিনের জন্য সুরক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তেমন কঠিন কোন বিষয় নয়। আর এই দিনগুলোতে সুরক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণের সামর্থ্যও তার ছিল। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন, যদিও বাহ্যিক পরিস্থিতি এর বিপরীত ছিল। ৬ মার্চ তার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। ১ মার্চ লেখরামকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মূলতান পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয় (এটি তাদের কমিটি ছিল)। সেখানে ৪ মার্চ পর্যন্ত সে চারটি বক্তৃতা দেয়। এরপর 'সভা' তাকে সাখ্খার যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করে। কিন্তু সেখানে প্লেগ-এর প্রকোপের কারণে মূলতানের আর্য সমাজীরা তাকে সেখানে যেতে দেয় নি। এরপর পণ্ডিত লেখরাম মুজাফ্ফর গড় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এটি জানা নেই যে, এরপর কেন সে সরাসরি লাহোরে ফেরত চলে আসে আর ৬ মার্চ দুপুর নাগাদ এখানে এসে পৌঁছে। সে যদি সে দিনই ফিরে না আসত, তাহলে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হত না। কিন্তু বাহিরে থাকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে লাহোরে পৌঁছে আর নির্ধারিত সময় নিহতও হয়। অতএব, সুস্থতা এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে নিহত হতে পারে, এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট এক উদাহরণ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাজে হস্তক্ষেপ করেন আর তিনি যখন চান এবং যেভাবে চান নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ২৭৩)**

সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবেরও উল্লেখ হয়েছে, যার বিরামহীণ সেবা করার কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের স্বাস্থ্যের উপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ছেলের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহ পরবশ ছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমাদের এক ছোট ভাই ছিল, যার নাম ছিল মুবারক আহমদ। বেহেশতী মকবেরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবরের পূর্ব দিকে তার সমাধি রয়েছে। তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুবই আদরের পাত্র ছিলেন। [তার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল এবং তিনি কীভাবে তার খেয়াল রাখতেন এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে, যখন আমরা ছোট ছিলাম একবার আমাদের মুরগী পালার শখ জাগে।] কিছু মুরগী আমি রাখি, কিছু মরহুম মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব রাখেন আর কিছু মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব রাখেন। আর বাল্যকালের

শখ অনুযায়ী আমরা সকাল সকাল গিয়ে মুরগীর ঘর খুলতাম, ডিম গুণতাম আর একে অপরের সাথে এই বলে গর্ব করে বলতাম, আমার মুরগী এতটি ডিম দিয়েছে আর অপর জন বলত, আমার মুরগী এতগুলো। আমাদের এই শখে মরহুম মুবারক আহমদও ভাগী হতো। হঠাৎ একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শিয়ালকোটের এক মহিলা তার দেখাশুনা করতেন, যিনি 'দাদী' নামে পরিচিত ছিলেন। আমরাও তাকে দাদী-ই ডাকতাম আর অন্যরাও একই নামে ডাকত। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) তাকে দাদী ডাকাতে খুবই বিরক্ত হতেন। কিন্তু নাম ছাড়া তার আর কোন পরিচয় ছিল না। তাই [হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)] তাকে দাদী ডাকার পরিবর্তে 'জগ-দাদী' ডাকতেন। যখন মরহুম মুবারক আহমদ অসুস্থ হয়, তখন সেই দাদী বলেন, তার অসুস্থতার কারণ হল, সারাদিন সে মুরগীর পিছনে পড়ে থাকে (অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটায়, যা এক নোংরা জায়গা)। এ কথা জানার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আম্মাজানকে বলেন, মুরগীগুলো গুণে নিয়ে (অর্থাৎ কার কতটি মুরগী আছে তা গুণে নিয়ে) এর মূল্য বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেয়া হোক আর মুরগীগুলো জবাই করে খেয়ে ফেলা হোক। অতএব, বোঝা গেল, মুবারক আহমদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক স্নেহভাজন ছিল। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৮১-৫৮২)**

কিন্তু এই পুত্র, যার এত সেবা-যত্ন তিনি (আ.) করেছিলেন, যাকে এত ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন, সেই পুত্রের মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতির চিত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মানসিক অবস্থা তখন কিরূপ হয়, সে সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের ছোট ভাই মরহুম মুবারক আহমদকে খুবই ভালোবাসতেন। সে অসুস্থ হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এত মনোযোগের সাথে তার চিকিৎসা করেন আর এত পরিশ্রম করেন যে, অনেকে মনে করত, মুবারক আহমদ যদি মারা যায়, তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভীষণ কষ্ট পাবেন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) অনেক দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। যে দিন মরহুম মুবারক আহমদ মারা যায়, সে দিন সকালের নামায পড়িয়ে তিনি মুবারক আহমদকে দেখতে আসেন। সে সময় মুবারক আহমদকে ঔষধ খাওয়ানো এবং তার শুশ্রূষার দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমিই নামাযের পর হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। সেখানে আমি ছিলাম, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) ছিলেন, ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব ছিলেন আর সম্ভবত ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবও ছিলেন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) মুবারক আহমদকে দেখার জন্য উপস্থিত হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মনে হচ্ছে অবস্থা ভালো-র দিকে, ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল অন্তিম মুহূর্ত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে নিয়ে এলাম তখন মুবারক আহমদের মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে ছিল। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) তার বাম দিকে দাঁড়ান এবং তার নাড়ীতে হাত রাখেন, কিন্তু তার নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় নি। এতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, হুযূর! 'মুশক' (অর্থাৎ কস্তুরি) আনুন। আর তিনি নিজ হাত (মুবারকের) কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভবের চেষ্টা করেন, হয়তোবা নাড়ী সেখানে অনুভূত হবে। কিন্তু সেখানেও নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায় নি। তখন তিনি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, হুযূর! তাড়াতাড়ি 'মুশক' নিয়ে আসুন। আর তিনি নিজে তার বগলের কাছে হাত নিয়ে চেপে ধরে নাড়ী অনুভব করার চেষ্টা করেন। আর সেখানেও যখন নাড়ী অনুভূত হয় নি, তখন বিচলিত হয়ে তিনি বলেন, হুযূর! দ্রুত 'মুশক' নিয়ে আসুন।

ইতিমধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চাবির গোছা থেকে ট্রাঙ্কের চাবি খুঁজে বের করে তালা খুলছিলেন। শেষ বার যখন হযরত মৌলভী সাহেব বিচলিত কণ্ঠে বললেন, হুযূর শিগ্‌গির 'মুশক'

নিয়ে আসুন, ধারণা এমন ছিল যে, মুবারক আহমদের মৃত্যুতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভীষণ কষ্ট পাবেন, অনেক সাহসী হওয়া সত্ত্বেও [হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর] পা তখন কেঁপে উঠে এবং তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মাটিতে বসে পড়েন। আগে তার ধারণা ছিল হয়তবা হৃদপিণ্ডের কাছাকাছি নাড়ী চলমান আছে আর 'মুশক' দ্বারা শক্তি পুনর্বহাল করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর এই ধারণা ছিল কল্পনামাত্র।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এই কম্পিত স্বর শুনে বাস্তবতা অনুভব করে বুঝতে পারেন যে, মুবারক আহমদের এখন অন্তিম সময়। তাই তিনি (আ.) ট্রাঙ্ক খোলা বন্ধ করে দেন আর বলেন, মৌলভী সাহেব ছেলে হয়ত মারা গেছে। আপনি এত বিচলিত হয়ে পড়ছেন কেন? **সে আল্লাহ্ তা'লার এক আমানত ছিল, যা তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। এখন তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।** তাই এতে আমাদের কী কোন অভিযোগ থাকতে পারে? আরও বলেন, আপনি হয়তবা ভাবছেন, যেহেতু আমি তার অনেক সেবা-শুশ্রুষা করেছি তাই আমার কষ্ট হয়ত অনেক বেশি হবে। সেবা-শুশ্রুষা করা তো আমার দায়িত্ব ছিল, যা আমি পালন করেছি। আর এখন, যখন কিনা সে মৃত্যু বরণ করেছে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। অতএব, তখনই তিনি (আ.) বসে বন্ধুদেরকে (মুবারকের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে) চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন। **(আল্ ফযল, ১৪ মার্চ ১৯৪৪, পৃ: ৪, ৩২তম খণ্ড, নম্বর-৬১)**

একই প্রসঙ্গে অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যেখানে ঔষধ রাখা ছিল সেখানেই পোষ্টকার্ডও রাখা ছিল। তখন তিনি (আ.) ঔষধ বের করার পরিবর্তে সেখান থেকে পোষ্ট কার্ড বের করেন, কলম বের করেন আর বন্ধু-বান্ধব এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনদের পত্র লিখতে আরম্ভ করেন যে, মুবারক আহমদ মৃত্যু বরণ করেছে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩২)**

সে আল্লাহ্ তা'লার এক আমানত ছিল, যা তিনি আমাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে গেছেন। অতএব, মু'মিনের আসল কাজ হল, একদিকে সে যথাসম্ভব অপরের সেবা করে এবং এই সেবা করাকে নিজের জন্য পুণ্যের কারণ মনে করে, কিন্তু অপর দিকে যখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তখন সে কোন প্রকার অস্থিরতার প্রকাশ করে না। সে মনে করে, সেবা করার সওয়াব আমি লাভ করেছি। কিন্তু যারা আতঙ্কিত ও বিচলিত হয়, তাদেরকে ইহজগতেও দুঃখ-যাতনার মধ্যে কাটাতে হয় আর পরকালেও কষ্ট পোহাতে হয়। আর তার চেয়ে অধিক হতভাগা আর কে হবে, যে এই উভয় বিপদেরই সম্মুখীন হয় অর্থাৎ, ইহজগতের বিপদও সহ্য করে আর পরজগতের কষ্টও ভোগ করে। **(আল্ ফযল, ১৪ মার্চ ১৯৪৪, পৃ: ৪, ৩২তম খণ্ড, নম্বর-৬১)**

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এই বিষয়েই কাদিয়ানের অধিবাসীদের সম্বোধন করে বলেন, "এখানকার অধিবাসীরা দেখে থাকবে, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব আর মুবারক আহমদের অসুস্থ থাকা কালীন সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের চিকিৎসার প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন। যারা দেখেছে, তারা মনে করত, তাদের জীবন রক্ষা করার মাঝেই বুঝি তিনি (আ.) নিজের এই জামা'তের উন্নতি নিহিত বলে মনে করতেন। সেই দিনগুলোতে এছাড়া আর কোন কথাই হত না যে, চিকিৎসা কীভাবে করা যায় আর কী কী চিকিৎসা রয়েছে? কিন্তু তাদের মৃত্যুর সময় কী হয়েছে? এটিই হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর (আ.) অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে, যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। একদিকে এত ব্যাকুলতা ছিল যে, (মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বা সাহেবজাদা মুবারক আহমদ যখন অন্তিমকালে উপনীত হয়, তখন) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু তাদের চিকিৎসা নিয়েই কথা হত, আবার হাসিমুখে এবং উচ্ছসিত চেহারায় তিনি (আ.) এ বক্তৃতাও করেছেন যে, তাদের মৃত্যুর বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই তাঁকে অবগত করেছিলেন।"
(খুতবাতে মাহমুদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩১)

এরপর তিনি (রা.) অপর এক স্থানে এই ঘটনা এভাবেও উল্লেখ করেছেন যে, মুবারক আহমদের মৃত্যুর পর তিনি (আ.) ঘর থেকে বাইরে আসেন (বাহিরে অন্যান্য লোকেরাও উপস্থিত ছিল, তাই তিনি বাইরে আসেন) এবং আসন গ্রহণের পর প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা আর এ ধরণের পরীক্ষায় আমাদের জামা'তের দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। পুনরায় বলেন, মুবারক আহমদের বিষয়ে অমুক সময় আমার প্রতি ইলহাম হয়েছিল যে, অল্প বয়সেই বা শৈশবেই সে মারা যাবে। তাই এটি তো আনন্দের কারণ কেননা, খোদা তা'লার নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন— অতএব, আমাদের নিজের ভাই, পুত্র বা অন্য কোন নিকটাত্মীয় যদি মারা যায় এবং তার মৃত্যুর বিষয়ে যদি খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাহলে দুঃখিত হওয়ার পাশাপাশি আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াতে আনন্দিতও হব। কিন্তু আনন্দিত হওয়ার অর্থ আমরা তাদেরকে পর মনে করি- এমন নয়। তারা আমাদের আপনজনই, তবে খোদা তা'লা তাদের চেয়েও বেশি আপন। আর খোদা তা'লার কোন নিদর্শনকে আড়াল করা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হল, জগত সমক্ষে নিজেদের উভয় গুণের বহিঃপ্রকাশ করা। একদিকে আমাদের উচিত খোদা তা'লার এই শাস্তিমূলক নিদর্শনকে পৃথিবীতে প্রচার করা এবং মানুষকে অবহিত করা যে, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। আর অপর দিকে বিপদগ্রস্ত এবং আহতদের সাহায্য করা। [এর অর্থ হল, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় যারা মারা যায়, তারাও আমাদেরই আপনজন। তারা মারা যাচ্ছে কতিপয় শাস্তিমূলক বা ক্রোধপ্রকাশক নিদর্শনের কারণে, যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করেছিলেন। তাই আমাদের উচিত অন্যদেরকে তা অবহিত করা যে, এটি হল একটি কারণ। এরপর তিনি (রা.) আরও বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে আর অপরদিকে আমরা বিপদগ্রস্ত এবং পীড়িতদের সাহায্যও করি। মানুষ নিদর্শনস্বরূপ মৃত্যুবরণ করছে বলে আমরা কেবল আনন্দিত হব, তা নয়। বরং আমরা যেন এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার কারণে যারা পীড়িত, যারা বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও কষ্টে নিপতিত, যারা বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে, আমরা যেন তাদের সাহায্যও করি] যেন জগদ্বাসী বুঝতে পারে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তা প্রকাশে যেমন কোন সমস্যা বা তিরস্কারের ভয় করি না, তেমনিভাবে আমাদের চেয়ে বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের অন্য কেউ নেই। (আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামা'ত সকল জায়গায় বিপদগ্রস্তদের সাহায্যও করে থাকে।) আমরা যদি আমাদের মাঝে এই উভয় গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারি, তাহলে খোদা তা'লারও উভয় শক্তি আমাদের স্বপক্ষে প্রকাশিত হবে অর্থাৎ, সেই প্রতাপেরও প্রকাশ হবে, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় আর সেই শক্তিও, যা ইহজগতে প্রকাশিত হয়। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৬শ খণ্ড, পৃ: ৩৩৮-৩৩৯, জুমুআর খুতবা, ৭ জুন ১৯৩৫)**

অতএব, এসব ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনাচারের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত করে। ছেলের সেবা, তার চিকিৎসার চিন্তা, নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চিন্তা, তার চিকিৎসার প্রতি সচেতন দৃষ্টি দেয়া, এরপর নিদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ আর ঐশী নিয়তি যখন পূর্ণ হয়, তখন এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যে, কিছুই যেন হয়নি, এ সবই তিনি করছেন জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করতে এবং মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পথনির্দেশ প্রদান করতে যে, আসল লক্ষ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তোষ এবং সন্তুষ্টি অর্জন। আর তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন, তা পূর্ণ হওয়াতে একদিকে যেমন স্বস্তি রয়েছে, তেমনি অপরদিকে মানবতার

সেবার প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে পূর্ণ শক্তি এবং মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাদের সেবাও করতে হবে।

সাহেবযাদা মুবারক আহমদ সাহেবের মেধা এবং স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি চেতনাবোধ ও চেতনাহীনতার উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। যারা হযরত সাহেবকে দেখেছেন তারা জানেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুবারক আহমদকে কতটা ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার পেছনে অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, সে দুর্বল ছিল আর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। তাই তিনি তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। আর যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে, তার প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়ে যায় আর এটিই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট এবং বয়স অনেক কম থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ-ভালোবাসার এটিও একটি কারণ যে, সে ছিল অত্যন্ত ধীমান এবং উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল প্রখর। তার বয়স মাত্র সাত বছর ছিল, কিন্তু এই বয়সেই সে নিজ থেকে কবিতার পংক্তি বলতে পারত আর সাধারণত তার কবিতার পংক্তিমালা চয়ন এবং ছন্দও সঠিক হত। (এত ছোট বয়সেও কবিতা লিখতে পারতেন আর সেই কবিতা সঠিক নিয়ম অনুসারে হত)। তার মেধা এবং স্মৃতিশক্তির একটি উদাহরণ হল, হযরত সাহেব যখন সেই বড় নযম, যার চরণ হল, 'এহী হ্যা' লিখলেন তখন আমাদের সবাইকে তিনি বললেন, তোমরা এর কাফীয়া অর্থাৎ স্তবকের অন্তমিল অনুসন্ধান কর। সে অর্থাৎ সাহেবজাদা মুবারক আহমদ আমাদের সবার চেয়ে বেশি মিত্রাক্ষর বা স্তবকের অন্তমিল বের করে, যার মাঝে অনেকগুলো অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ছন্দ ছিল। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭-৭৮, জুমুআর খুতবা, ১৮ জুন ১৯২০)**

রাব্বুল আলামীনের বিকাশস্থল হবার জন্য সৃষ্টি সেবার গুরুত্ব

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যার বিষয়বস্তু হল, **দৈহিক ভাবেও সৃষ্টির সেবা** করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লার রবুবীয়্যত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। তিনি (রা.) বলেন, একটি দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারি না। আমি তখন কিশোর আর বয়স ছিল ষোল-সতের বছর। সেই সময় আমাদের এক ছোট বোন, যার বয়স মাত্র কয়েক মাস ছিল, সে মারা যায় আর তাকে দাফন করার জন্য সেই কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যা সম্পর্কে আহরাররা বলত, আহমদীরা এখানে সমাহিত হতে পারে না। জানাযার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাশ নিজের হাতে তুলে নেন। তখন মির্যা ইসমাঈল বেগ সাহেব মরহুম, যার এখানে দুধের দোকান ছিল তিনি সামনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হুযূর! লাশ আমার হাতে দিন, আমি বয়ে নিচ্ছি। এ কথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার দিকে ঘুরে তাকান আর বলেন, সে আমার মেয়ে অর্থাৎ, মেয়ে হওয়ার দিক দিয়ে তার দৈহিক সেবা, যা তার প্রাপ্য সেবা এটাই হতে পারে যে, আমি নিজেই তাকে বহন করে নিয়ে যাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, (অর্থাৎ তিনি এই ঘটনা থেকে এই ফলাফল বের করছেন যে,) যদি 'রাব্বুল আলামীন' বৈশিষ্ট্যের বিকাশস্থল হতে চাও, তাহলে তোমাদের জন্যও দৈহিকভাবে সৃষ্টির সেবা করাও আবশ্যকীয়। যদি তুমি ধর্মের সেবায় নিজের সকল সম্পদ ব্যয় কর, নিজের সাকুল্য উপার্জন ইসলাম প্রচারে উজার করেও দাও, তাহলে তুমি মালিকিয়্যত এর বিকাশস্থল হয়ে গেলেও রাব্বুল আলামীন এর বিকাশস্থল কিন্তু হতে পারবে না। কেননা, রাব্বুল আলামীন এর বিকাশস্থল হওয়ার জন্য তোমার স্বহস্তে কাজ করা এবং দরিদ্রদের সেবায় নিয়োজিত থাকা আবশ্যক। কাজেই, রাব্বুল আলামীন এর বিকাশস্থল হওয়ার ক্ষেত্রে এটি এক অতি উচ্চাঙ্গের সুন্দর ব্যাখ্যা যে, নিজ হাতে কেবল স্বজনেরই নয় বরং অন্যদেরও সেবা করার চেষ্টা কর। যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী, যা জাতির লোকদের পরস্পরকে

দৃঢ় সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ করে আর সমাজের সকল অংশ যদি এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সুন্দর এক সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল বা খোদা নীর্ভরতা, দোয়া কবুলীয়্যত ও নিজ সত্যতার উপর দৃঢ় ও পূর্ণ বিশ্বাস সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার কপুরথলার আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে সেখানকার একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে মামলা হয়। যে জজ বা বিচারপতির আদালতে এই মামলা ছিল, সে বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা আরম্ভ করে। এতে কপুরথলা জামা'ত বিচলিত হয়ে পড়ে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার জন্য লিখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে তাদেরকে লিখেন, আমি যদি সত্য হয়ে থাকি, তাহলে তোমরা মসজিদ পেয়ে যাবে। কিন্তু অপরদিকে সেই জজ যথারীতি তার বিরোধিতা অব্যাহত রাখে আর অবশেষে সে আহমদীদের বিরুদ্ধে রায় লিখে দেয়। কিন্তু পরের দিন যখন সে নিজের রায় পড়ে শোনানোর জন্য আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন সে নিজ ভৃত্যকে বলে, আমাকে জুতা পরিয়ে দাও। ভৃত্য একটি জুতা পরিয়ে দ্বিতীয়টি কেবল পরাচ্ছিল, ঠিক তখনই খট করে একটি শব্দ হয়। সে উপর দিকে তাকালে দেখতে পায় যে, জজের হার্ট ফেল হয়েছে বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পর অন্য আরেকজনকে জজ নিযুক্ত করা হয় আর সে পূর্বের রায় পরিবর্তন করে আমাদের জামা'তের অনুকূলে রায় প্রদান করে। এটি বন্ধুদের জন্য এক বিরাট নিদর্শন প্রমাণিত হয় আর তাদের ঈমান আকাশসম উন্নতি লাভ করে। মোটকথা, এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি, তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে লাগাতার অদৃশ্যের সংবাদ দিতে থাকেন, যা পূর্ণ হওয়ার পর মু'মিনদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়। যারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছিল এই অদৃশ্যের সংবাদের ফলশ্রুতিতেই তাদের হৃদয় এত দৃঢ় হয়ে যায় যে, অন্যরা যেখানে মৃত্যু দেখে ক্রন্দন করে, সেখানে সাহাবীদের কেউ যখন খোদা তা'লার রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার সুযোগ পেতেন, তখন তারা আনন্দে উদ্বেলিত হতেন আর বলতেন, **"ফুয্তু ওয়া রাব্বিল কা'বাতে"** অর্থাৎ **ক্বাবার প্রভুর কসম! আমি সাফল্য অর্জন করেছি**। (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭-২৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি কাশ্ফ কয়েক মিনিটের মাঝে পূর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কখনো কখনো জাগ্রত অবস্থায়ও কোন দৃশ্য দেখানো হয় কিন্তু তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয় না, বরং **ফালাকাস্ সুবহো** (অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রভাত)-এর মত ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন কাশফের মাঝেও আমরা এমন উদাহরণ দেখতে পাই।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাশফের অবস্থায় দেখেন, মুবারক আহমদ চাটাইয়ের পাশে পড়ে আছে আর সে মারাত্মক ব্যাথা পেয়েছে। এই কাশ্ফ দেখার পর তিন মিনিট সময়ও অতিবাহিত হয় নি, মুবারক আহমদ যে কিনা চাটাইয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, তার পা পিছলে যায় এবং সে মারাত্মক ব্যাথা পায় আর তার কাপড় রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৭)

প্রাথমিক অবস্থায় কাদিয়ানের চিত্র, কাদিয়ান ও জামা'তের ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রসঙ্গে তিনি (রা.) বলেন, সেই এক যুগ ছিল, যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কেউ ছিল না। এরপর সেই সময় আসে, যখন তাঁর সাথে হাজার হাজার মানুষ ছিল আর এখন তো লাখ লাখ হয়ে গেছে। আবার এমন এক সময়ও ছিল, যখন পুরো পাঞ্জাবে তাঁর কোন অনুসারী ছিল না আর এখন কেবল হিন্দুস্থানেই নয়, বরং পৃথিবীর সকল মহাদেশে আহমদীরা ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর মানুষ

আমাদের মান্য করে না- একথা সত্য হয়ে থাকলে এত লোক কোথা থেকে আসল? অর্থাৎ, আমাদেরকে বা আহমদীয়া জামা'তকে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পৃথিবীর লোকেরা যদি না-ই মেনে থাকে, তাহলে এত লোক কোথা থেকে আসল। [আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দেশে দেশে আহমদী হচ্ছে বা আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করছে। তিনি (রা.) বলেন-] এখানেই দেখে নাও, একটি বড় সংখ্যা এখন আমার সামনে উপবিষ্ট আছে। এদের মাঝে ক'জন এমন আছে, যারা প্রাথমিক যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল? আমি মনে করি এই সমাবেশে এমন মানুষ অনেক কমই থাকবে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা দেখেছে। এদের অধিকাংশই এমন, যারা কেবল তাঁর ছবি দেখেছে। আবার কিছু এমনও আছে, যারা চেহারা দেখেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর সাহচর্যে বসার সুযোগ তাদের হয় নি। আর খুব কমই এমন আছে, যারা তাঁর কথা শুনেছে আর তাঁর সাহচর্য থেকে কল্যাণ লাভের সুযোগ পেয়েছে। সম্ভবত এর সংখ্যা ডজনের বেশি হবে না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে এরা সব এল কোথা থেকে? [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার জন্ম এবং বয়আতের ধারা প্রায় একই সন্ধিক্ষণে যাত্রা শুরু করেছে। (অর্থাৎ পাশাপাশি যাত্রা করেছে)। আর আমি যখন কিছুটা বোঝার বয়সে উপনীত হলাম, তখন পর্যন্ত তবলীগি কার্যক্রমের বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের শৈশবকালের এ কথাও আমার স্মরণ আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন ভ্রমণে বের হতেন, তখন কেবল হাফেয হামেদ আলী সাহেব তাঁর সাথে থাকতেন অর্থাৎ, তারা কেবল দু'জন হতেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকেই ভ্রমণে আসেন। (এখানে কাদিয়ানের কোন এক এলাকার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, এদিকে ভ্রমণে আসেন।) তখন আমি যেহেতু ছোট বালক ছিলাম, তাই আমি জেদ ধরলাম যে, আমিও ভ্রমণে যাব। সে যুগে এখানে ঝাউ গাছ ও ঝোপ-ঝাড় ছিল। [অর্থাৎ সেই জায়গায় যেখানে তিনি (রা.) ইঙ্গিত করছেন।] আর এই পুরো এলাকা যেখানে এখন তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল, বোর্ডিং এবং মসজিদ ইত্যাদি রয়েছে, তা এক জঙ্গল ছিল। আর এখানে ঝাউ গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকেই ভ্রমণে আসেন আর আমার জোরাজুরির কারণে আমাকেও সাথে নেন। কিন্তু কিছুদূর হাঁটার পর আমি চেঁচামেচি আরম্ভ করি যে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এর ফলে আমাকে কখনো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোলে তুলে নিতেন আর কখনো নিতেন হাফেয হামেদ আলী সাহেব। আর এ দৃশ্য আমার স্মৃতিতে আজও অম্লান। মোটকথা, সেটি এমন এক যুগ ছিল যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি থাকলেও তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। আর কাদিয়ানে আগন্তুকের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি সেই ১৯৩৭ সনের কথা বলেছেন।] তিনি বলছেন, কিন্তু আজ এমন যুগ এসেছে যখন আমাদেরকে বার বার ঘোষণা করতে হয়, কাদিয়ানে হিজরত করে আসার পূর্বে সবার অনুমতি নেয়া উচিত। আর কেউ যদি বিনা অনুমতিতে এখানে হিজরত করে চলে আসে, তাহলে তাকে ফেরত যাওয়ার জন্য বাধ্যও করা যেতে পারে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৬৫৯-৬৬০, জুমুআর খুতবা, ২৪ জুন ১৯৩৭)**

অতএব, এ সব ঘটনা ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দানকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ঈমান এবং বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন আর আমরা সবাই যেন জামা'তের জন্য কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হই।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াব, যা শ্রদ্ধেয়া নাসীম মাহমুদ সাহেবার। যিনি করাচীর সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ শাহ্ সাহেবের স্ত্রী। গত ২৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ৫৮ বছর বয়সে তিনি করাচীতে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমার পিতা ১৯৫৩ সনের দাঙ্গা-হাঙ্গামার যুগে একটি ঘটনার পর ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা করে

জামা'তভুক্ত হয়েছিলেন। বিরোধিতাও যে পথের দিশা দেয়, এটি তারই প্রমাণ। ঘটনার বিবরণ এরূপ, মোকাররম মালেক মুহাম্মদ রফিক সাহেব পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকরী করতেন। তিনি লাহোর থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে রায়উন্ড থেকে মৌলভীদের একটি দল ট্রেনে উঠে। এটি ৫৩ সনের ঘটনা, যখন পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রথমবার দাঙ্গা দেখা দেয়। রায়উন্ড থেকে উগ্র মৌলভীদের একটি দল সেই ট্রেনে এই বলে উঠে যে, আমরা জিহাদে যাচ্ছি আর সেই জিহাদ হল, কাদিয়ানী মতবাদকে এ দেশ থেকে উৎখাত করে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। তিনি বলেন, টিকিট চেকার আসলে মালেক মুহাম্মদ রফিক সাহেব এবং তার সঙ্গী অফিসার ছাড়া ওই মৌলভীদের কারো কাছেই কোন টিকিট পাওয়া যায় নি। তিনি ভাবেন, সেই মৌলভীরা বিনা টিকেটে গাড়িতে সফর করছিল, এরা যদি সত্য ও সঠিক হত এবং তাদের জিহাদ প্রকৃত জিহাদ হত, তাহলে এরা (বিনা টিকেটে সফর করে) জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করত না। আজকাল তো আরও বেশি ক্ষতি করা হয়। যাহোক, এ ঘটনার পর যখন তিনি নিজ কর্মস্থল করাচীতে পৌঁছেন, তখন অফিসার ইনচার্জকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের ইউনিটে কি কোন কাদিয়ানী আছে? এভাবে খুঁজে-পেতে একজন আহমদীর সাথে কথা বলেন এবং তথ্য নিয়ে অবশেষে তিনি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হন। যাহোক, এভাবে মরহুমার পিতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তার বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে।

মরহুমা ১৯৮৭ সন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত করাচীতেই শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। খোদা তা'লা মরহুমাকে ১৯৯৭ সাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের সেবা করার তৌফিক দান করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত আট বছর, এরপর ২০০৭ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ছয় বছর তিনি দু'মেয়াদে স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এরপর তাকে 'নিগরাণ' হিসাবে তদারকীর দায়িত্ব দেয়া হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচীর জেলা আমেলারও সদস্যা ছিলেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানেও সেবারত ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার পরিবারে তার স্বামী মোকররম সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ শাহ্ সাহেব ছাড়া দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। তার দু'পুত্রই জামাতের মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত আছেন। একজন হাফেয সৈয়্যদ শাহেদ আহমদ সাহেব, যিনি নাইজেরিয়াতে কর্মরত আর দ্বিতীয় পুত্র মোকাররম হাফেয সৈয়্যদ মশহুদ আহমদ সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যে সেবা করার তৌফিক লাভ করছেন। তিনি মায়ের জানাযাতেও যেতে পারেন নি।

হাফেয সৈয়্যদ মশহুদ আহমদ সাহেব লিখেন, খাকসারের মা নিজের উভয় পুত্রকে কুরআন হিফ্য করিয়ে খোদা তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করার তৌফিক লাভ করেন। দু'জনকেই কুরআনের হাফেয বানান এবং এরপর জামেয়ায় ভর্তি করান। মা সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতেন। আর শিশুকাল থেকেই আমাদেরকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেন যে, আমাদেরকে শুধুমাত্র জামা'তেরই খিদমত করতে হবে। তিনি বলেন, আমার স্মরণ আছে শিশুকাল থেকেই রাতে শোবার সময় দোয়া মাসুরা শিখানোর পাশাপাশি আমাদের জন্য দোয়া করা তার নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। বিশেষত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজ সন্তানদের জন্য লিখিত কাব্যিক দোয়া 'মেরে মওলা মেরি এক দোয়া হে' এই কবিতা সুরেলা কণ্ঠে এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সুরে পাঠ করতেন। এছাড়া সর্বদা তিনি বলতেন, তোমার বড় ভাইকে মুরুব্বী হতে হবে আর তোমাকে কুরআন শরীফ হিফ্য করার জন্য করাচী থেকে রাবওয়া যেতে হবে। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয় আর উভয় ভাই কুরআন শরীফও হিফ্য করেন আর পরবর্তীতে জীবন উৎসর্গ করে জামেয়াতে শিক্ষা লাভ করেন আর এখন মুবাল্লিগ হয়ে ধর্মের সেবা করছেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসাতুল হিফ্য-এ অবস্থানের দরুন আমাদের মা প্রায় প্রত্যেক মাসে করাচী থেকে রাবওয়া

আসতেন। সেই সময় রেলের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত খারাপ এবং কষ্টদায়ক ছিল। তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদের মুখস্থকৃত অংশ নিজেও শুনতেন। আমাদের কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রী করা এবং একদিন এই সেবা প্রদান করার পর পরের দিন আবার করাচীতে ফিরে গিয়ে নিজ স্কুলে পাঠদানের দায়িত্বও পালন করতেন। কেননা তিনি শিক্ষকতা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি (হাফেয মশহুদ সাহেব) জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি কিন্তু অসুস্থতার সময় একবার গিয়ে দেখা করে এসেছিলেন। তিনি বলেন, মায়ের অসুস্থতার সময় আমি যখন সেখানে যাই, তখন আমার মা আমাকে বলেন, সর্বদা আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়াই করি যে, 'হে আমার মালিক! আমাকে আমার ওয়াকেফীনে যিন্দেগী পুত্রদের জন্য পরীক্ষার কারণ করো না।' তার সীরাতের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল, তিনি আপন-পর, সবার মেয়েদের বিয়ের সমস্যা সমাধান এবং বৈবাহিক সম্পর্কের সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। খুবই আন্তরিকতা রাখতেন। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যদের সাথে কেবলমাত্র খোদা তা'লার খাতিরে সহানুভূতির যে সম্পর্ক ছিল, তাও অতুলনীয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকে সর্বদা ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২-২৮ মে ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২১তম সংখ্যা, পৃ: ৫-৮)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।